بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ই জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওলী বা বন্ধুদের এবং পুণ্যবান লোকদের সন্তান-সন্ততিকে প্রজন্ম পরম্পরায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন এবং তাদের স্বীয় অপার দানে ভূষিত করেন। তবে শর্ত হলো, সেই সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেন, দেখ! মহানবী (সা.) স্বীয় রিসালতের প্রারম্ভিক যুগে নিজ গোত্রের লোকদের সত্যের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেন। খাবার শেষ করার পর প্রথম আমন্ত্রণে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য তিনি দন্ডায়মান হন। কথা শুরু করতেই আবু লাহাব সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিনি (সা.) তার এই আচরণে হতভম্ব ছিলেন কিন্তু নিরাশ হন নি। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে পুনরায় নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন এবং দ্বিতীয়বার ইসলামের বাণী পৌঁছান। তখন উপস্থিত সবার ওপর নিরবতা ছেয়ে যায়, সবাই নীরব ছিল, কেউ কথা বলেনি। হযরত আলী (রা.) দন্ডায়মান হন এবং বলেন, যদিও বয়সে আমি সবার চেয়ে ছোট অর্থাৎ এখানে যারাই উপস্থিত আছেন তাদের সবার মাঝে আমি বয়সে ছোট কিন্তু আপনি যা বলেছেন এ বিষয়ে আপনার সঙ্গ দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আর সারা জীবন আপনার সঙ্গ দেয়ার অঙ্গীকার করছি। যাহোক এরপর মক্কায় বিরোধিতা চরমে পৌঁছে এবং মহানবী (সা.)-কে হিজরত করতে হয়। তখন হযরত আলী (রা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীর তৌফিক দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেন এবং বলেন, তুমি এখানে শায়িত থাক, এতে শত্রুরা তোমাকে দেখে আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হবে। তখন হযরত আলী (রা.) এ কথা বলেন নি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শত্রু আমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, সকালে যখন তারা জানতে পারবে তখন অসম্ভব নয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে বরং প্রশান্ত চিত্তে হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) বিছানায় শুয়ে পড়েন। প্রভাতে অবিশ্বাসীদের সামনে (আসল ঘটনা) স্পষ্ট হলে হযরত আলী (রা.)-কে তারা বেদম প্রহার করে। কিন্তু যাহোক ততক্ষণে হযরত রসূলে করীম (সা.) মক্কা থেকে হিজরতের কাজ সমাপ্ত করেছেন। হযরত আলী (রা.)-র এই কুরবানী তাকে পরবর্তীতে কি পরিমাণ পুরস্কারে ভূষিত করেছে বা ভূষিত করার ছিল সে সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর তখন কোন ধারণাই ছিল না। কোন পুরস্কারের জন্য বা কৃপাভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সেই ত্যাগ স্বীকার করেন নি বরং সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায়, তাঁর প্রেমে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই

ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তখন কেবলমাত্র খোদা তা'লারই একথা জানা ছিল যে, এই ত্যাগের বা এই কুরবানীর বিনিময়ে কত অসাধারণ সম্মান তাঁর লাভ হতে । আর শুধু হযরত আলীরই নয় বরং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার সন্তান-সন্ততি এবং প্রজন্মকেও খোদা তা'লা সম্মানে ভূষিত করবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলীর প্রতি প্রথম যে কৃপা করেছেন তাহলো , মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার সম্মান তিনি লাভ করেছেন। এরপর বিভিন্ন উপলক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর বিভিন্ন কাজের কারণে মহানবী (সা.) তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একবার মহানবী (সা.) কোন যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.)-কে মদিনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাকে মহিলা এবং শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, হে আলী! তুমি কি তুলনার নিরিখে আমার পক্ষ থেকে সেই মর্যাদা লাভ করা পছন্দ করবে না যা হারূন মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) হারূনকে নিজের অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, এতে হারূনের মর্যাদার হানী হয়নি। অতএব হযরত আলী (রা.)-রও আল্লাহ্ তা'লা এভাবে সম্মান এভাবে বৃদ্ধি করেছেন। এটি শুধু তার সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামে যত ওলী এবং সূফী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের বেশীরভাগ হযরত আলী (রা.)-এর সন্তান-সন্ততিরই অন্তর্ভুক্ত। এই ওলীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিদর্শনাবলী এবং সমর্থনে সম্মানিত করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি ঘটনা শুনেছি। সেই ঘটনা হলো, হারূন-উর-রশীদ কোন কারণে ইমাম মূসা রেযাকে কারাবন্দী করে রাখেন আর তার হাত ও পা দড়ি দিয়ে বেধে রাখা হয়। সে যুগে স্প্রিংয়ের জাজিম ছিল না, সাধারণ রুই বা তুলার জাজিম ব্যবাহার হতো। হারূন-উর-রশীদ রাজ প্রাসাদে আরামদায়ক জাজিমে সুখনিদ্রা যাপন করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, মহানবী (সা.) এসেছেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারায় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হারূন-উর- রশীদ! তুমি আমাদের ভালোবাসার দাবি তো কর ঠিকই কিন্তু তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি আরাম দায়ক জাজিমে গভীর নিদ্রায় মগ্ন আর আমাদের পুত্র প্রচন্ড গরমের মধ্যে হাত পা বাধা অবস্থায় কারাগারে পড়ে রয়েছে? এই দৃশ্য দেখে হারূন-উর-রশীদ ছটফট করে উঠে বসেন এবং নিজ কমান্ডারদের বা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তখনই কারাভ্যন্তরে যান এবং নিজ হাতে ইমাম মূসা রেযার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দেন। তিনি হারূন-উর-রশীদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি তো আমার ঘোর বিরোধী ছিলেন, ব্যাপার কী যে, এখন আপনি নিজেই এখানে চলে এলেন? হারূন-উর-রশীদ তখন স্বপ্ন শুনিয়ে বলেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, প্রকৃত সত্য আমার জানা ছিল না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! সে যুগ এবং মহানবী (সা.) ও

হযরত আলী (রা.)-এর যুগের মাঝে কত বড় ব্যবধান ছিল। আমরা অনেক বাদশাহ্‌র সন্তান-সন্ততিকে দেখেছি যে, যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং দিল্লীতে এক পানি সরবরাহকারীকে দেখেছি যে মোঘল বাদশাহ্‌দের সন্তান-বংশধর ছিল, সে মানুষকে পানি পান করাত। কিন্তু তার মাঝে এতটা লজ্জাবোধ অবশ্যই ছিল যে, সে মানুষের কাছে হাত পাততো না, কায়িকশ্রম করছিল। যাহোক বাদশাহ্‌র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ শ্রমিক হিসেবে দিনাতিপাত করছিল। অপরদিকে হযরত আলী (রা.)-এর সন্তানকে দেখ! এত প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এক বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করেন এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) যদি এই সম্মানের কথা জানতেন আর অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন আর শুধু এই সম্মানের জন্য যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে তার ঈমান কেবল ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতো, কোন নিয়ামত বা পুরস্কারের কারণ হতো না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় একজন ওলীর বা খোদার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি জাহাজে আরোহিত ছিলেন এবং এমতাবস্থায় ঝড় উঠে। জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল কিন্তু তার দোয়ায় রক্ষা করা হয়েছে। দোয়ার সময় তার প্রতি ইলহাম হয়, তোমার জন্য আজ আমরা সবাইকে রক্ষা করেছি। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! কেবল বড় বড় বুলি আওড়ালেই এই সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় না বরং এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়, পিতা-পিতামহের পুণ্য বা নেকী অব্যাহত রাখতে হয়। অতএব পুণ্যবানদের ও ওলীদের এবং বুযূর্গদের বংশধর হওয়া তখনই কল্যাণকর হতে পারে যদি মানুষ নিজেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কিছু কথা এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। জামাতের সাথে অর্থাৎ বাজামাত নামায পড়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সচেতনতা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নামায কত প্রিয় ছিল দেখুন! কোন অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে তিনি (আ.) মসজিদে আসতে না পারলে আর ঘরেই নামায পড়তে হলে তখন আমার মা এবং ঘরের শিশুদের সাথে নিয়ে তিনি বাজামাত নামায পড়তেন অর্থাৎ শুধু নামাযই পড়তেন না বরং জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়তেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং একবার বাজামাত নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **"খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, সমগ্র মানবমন্ডলীকে এক আত্মা বা এক সত্তায় পরিণত করা। এরই নাম জাতিগত বা সমষ্টিগত ঐক্য।"** তিনি (আ.) বলেন, **"তসবীহ্‌র দানার মত সবার গণ ঐক্যের মালায় গ্রথিত হওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য।**

ধর্ম সেটিই যা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, এক দেহে রূপান্তরিত করে।" তিনি (আ.) বলেন, **"এই যে জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়া হয় তাও এই ঐক্যের জন্যই যেন সব নামাযী একক সত্তায় রূপ নেয়। যার মাঝে অধিক জ্যোতি রয়েছে তার জ্যোতি দুর্বলের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও শক্তিশালী করবে– সম্মিলিতভাবে দাঁড়ানোর আদেশ এজন্য দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নামাযীরা যেন পরস্পর থেকে শক্তি অর্জন করে। এই গণ ঐক্য সৃষ্টি এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সূচনা আল্লাহ্ তা'লা এভাবে করেছেন যে, প্রথমে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো, সকল পাড়ায় পাড়াবাসীরা পাঁচবেলার নামায নিজ নিজ পাড়ার মসজিদে বাজামাত পড়বে যেন চারিত্রিক গুণাবলী পরস্পরের মাঝে সঞ্চালিত হয়, আর আলোর সাথে আলোর সম্মিলন ঘটে দুর্বলতাকে দূরীভূত করে। অধিকন্তু পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে যেন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।"** তিনি (আ.) বলেন, **"পরিচিতি খুবই ভালো জিনিস, এর ফলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় যা একতার ভিত্তিও বটে।"**

অতএব বাজামাত নামাযে মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয় সেখানে এর সমষ্টিগত কল্যাণও রয়েছে। যারা নামাযের জন্য মসজিদে আসে না বা অনেকে এমনও আছে যারা মসজিদে এসে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে না, তাদের নামাযে কোন উপকার হয় না। কেননা ইবাদত ছাড়া নামাযের আরো যে উদ্দেশ্য রয়েছে অর্থাৎ ঐক্য সৃষ্টি হওয়া, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সম্প্রীতির বন্ধন রচিত হওয়া তা সাধিত হয় না।

অতএব এই চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের নিজেদের নামাযের হিফাযত করতে হবে আর এই চেতনা নিয়েই আমাদের মসজিদে আসা উচিত যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে গ্রহণযোগ্য নামায পড়তে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

হযরত মুয়াবিয়ার নামায নষ্ট হওয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন, একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-র ফযরের সময় চোখ খুলেনি বা ঘুম ভাঙ্গেনি আর ঘুম ভাঙ্গার পর দেখেন, নামাযের সময় পেরিয়ে গেছে। এ কারণে তিনি সারাদিন কাঁদতে থাকেন। পরের দিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন এসে নামাযের জন্য তাকে ডাকছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? সে বললো, আমি শয়তান, তোমাকে নামাযের জন্য জাগাতে এসেছি। তিনি বলেন, নামাযের জন্য উঠানোর সাথে তোর কি সম্পর্ক? ব্যাপার কী? সে বললো, গতকাল তোমাকে ঘুমানোর জন্য উৎসাহিত করেছি ফলে তুমি ঘুমিয়েছিলে, নামায পড়তে পারনি, যে কারণে তুমি সারাদিন অশ্রুপাত করেছো এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাকে এই ক্রন্দনের কারণে বাজামাত নামাযের চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি পুণ্য দাও অর্থাৎ

ফিরিশ্‌তাকে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পুণ্যের ভাগী করার নির্দেশ দেন। শয়তান বলে, এ কারণে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছি, নামায থেকে বঞ্চিত রাখার ফলে তুমি অধিক পুণ্যের ভাগী হলে। আজ আমি তোমাকে জাগাতে এসেছি যেন কোথাও তুমি আবার অধিক পুণ্যের ভাগী না হয়ে যাও। তিনি বলেন, শয়তান তখন মানুষের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করে যখন মানুষ শয়তানের কথা খন্ডন করে, শয়তান তখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায় এবং তাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই আমাদের উচিত হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানকে নিরাশ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করা, নিজেদের নামাযের হিফাযত করা আর যথাসময়ে নামায পড়ার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।

অনেক সময় কিছু মানুষ তড়িঘড়ি করে কোন কথায় অবগাহন না করে একটি সিদ্ধান্ত করে বসে আর এ কারণে অনেক দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হোঁচটও খায় বা স্খলিত হয়। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক ভোজ সভায় এক ব্যক্তিকে আমি বাম হাতে পানি পান করতে বারণ করি, সে পান করার জন্য বাম হাতে পানির গ্লাস নিচ্ছিল। আমি বললাম, যদি কোন বৈধ কারণ না থাকে তাহলে ডান হাতে পানি পান কর। সে বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বাম হাতে পানি পান করতেন অথচ হুযূরের এমনটি করার একটি বৈধ কারণ ছিল। আর তাহলো, শৈশবে পড়ে গিয়ে তিনি হাতে ব্যথা পান আর এতে হাত এত দুর্বল হয়ে যায় যে, গ্লাস উঠাতে পারতেন ঠিকই কিন্তু মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু এমন নয় যে, তিনি সুন্নতের অনুসরণ করতেন না বরং রসূলের সুন্নতের অনুবর্তীতার সচেতনতা নিয়ে তিনি বাম হাতে গ্লাস উঠাতেন কিন্তু নিচে ডান হাতের সাপোর্ট রাখতেন বা সাহায্য নিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর হাতের দুর্বলতার কথা নিজেও এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **একবার কতিপয় অ-আহমদী বা বিরোধীর সামনে যারা আমার সাথে বিতর্কের জন্য বা আলোচনার জন্য এসেছিল, গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা উঠালাম তখন সামনে উপবিষ্ট অ-আহমদী আপত্তি করে বসে, আপনি সুন্নত অনুসরণ করেন না, বাম হাতে পেয়ালা বা গ্লাস ধরে পান করার চেষ্টা করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ত্বরাপরায়ণতা এবং কু-ধারণা তাকে আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করতে প্রবৃত্ত করেছে, অথচ আঘাতের কারণে আমার হাত দুর্বল, আমি ডান হাতে পেয়ালা তুলে মুখ পর্যন্তও নিয়ে যেতে পারি না কিন্তু আমি অবশ্যই বাম হাতের নিচে আমার ডান হাত রাখি।** অতএব ত্বরাপরায়ণতা যেখানে শত্রুকে কু-ধারণায় প্রবৃত্ত করছে সেখানে আপনজনরা বুদ্ধিহীনতা ও ত্বরাপরায়ণ মনমানসিকতার কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত বিরোধী কোন কাজ করছেন। অথচ তার উচিত ছিল এর কারণ উদ্ঘাটন করা এবং

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন বারণ করেছেন তখন তার বিরত হওয়া উচিত ছিল এবং জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, এর কারণ কি? যাহোক এসব ত্বরাপরায়ণতাই বিভিন্ন প্রকার বিদআতে পর্যবসিত হয় আর ভ্রান্ত তফসীর করে মানুষ ভুল সিদ্ধান্তে বা উপসংহারে উপনীত হয়।

এখন তওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন। তিনি (রা.) বলেন, একটি কথা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বারংবার শুনেছি। তুর্কির বাদশাহ্ আব্দুল হামীদ খান সাহেব যিনি অপসারিত হয়েছেন তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, **সুলতান আব্দুল হামীদ খানের একটি কথা আমার খুবই পছন্দনীয়। গ্রীসের সাথে যুদ্ধের যখন প্রশ্ন আসে তখন তার মন্ত্রীরা অনেক অজুহাত দেখায়। সত্যিকার অর্থে সুলতান আব্দুল হামীদ খান যুদ্ধের পক্ষাপাতী ছিলেন কিন্তু মন্ত্রীরা চাইতো না যে, যুদ্ধ হোক। তাই তারা বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করায়। অবশেষে তারা বলে, যুদ্ধের জন্য এটিও প্রস্তুত আর সেটিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলে, অমুক বিষয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি যা যুদ্ধের জন্য আবশ্যক।** মন্ত্রীরা এই পরামর্শ দিচ্ছিল। **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এভাবে ধরে নিতে পার বা তারা খুব সম্ভব এটিই বলে থাকবে যে, সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি গ্রীসকে সাহায্য করার বিষয়ে একমত, আর আমাদের কাছে এর কোন জবাব বা খন্ডন নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মন্ত্রীরা যখন এই পরামর্শ দিল আর সমস্যার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরলো এবং বললো, অমুক বিষয়ের ব্যবস্থা নেই তখন সুলতান আব্দুল হামীদ খান বলেন, কোন একটি দিক আল্লাহ্‌র জন্যও ছেড়ে দেয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুলতান আব্দুল হামীদের এই বাক্য খুবই উপভোগ করতেন এবং বলতেন, তার একথা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়।** অতএব মু'মিনের নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টার একটি দিক আল্লাহ্‌র জন্যও ছেড়ে দেয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে, সত্য বিষয় হলো, মু'মিন কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে না বরং সত্যিকার অর্থে কোন মানুষই এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না যেখানে গিয়ে সে বলতে পারে, এখন আর কোন দুর্বল দিক নেই এবং সব কিছুতেই পারফেকশান বা পরিপূর্ণতা এসে গেছে। যদি কোন মানুষ বলে, আমি আমার কাজ এমনভাবে সমাধা করবো যে, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বিপত্তি থাকবে না, তার এমনটি বলা নির্বুদ্ধিতার শামিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে উপকরণকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা অর্থাৎ বাহ্যিক উপায়- উপকরণের ব্যবস্থা না করাও নির্বুদ্ধিতার শামিল। তিনি (রা.) বলেন, এখন ইউরোপীয়ান জাতিগুলো প্রথম নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'লার দিকটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। অপরদিকে মুসলমানরা দ্বিতীয় প্রকার নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত অর্থাৎ তারা তাওয়াক্কুল বা

আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার ভ্রান্ত অর্থ করে নিজেদের হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। সচরাচর পাশ্চাত্যের জাতিগুলো খোদাকে ভুলে গেছে আর মুসলমানরা সচরাচর নিজেদের জীবনে বা দৈনন্দিন কাজকর্মে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করার নামে পরিশ্রম করে না বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আরম্ভ করে। তাই সচরাচর এখানকার যুবকদের মাথায় এই প্রশ্ন জাগে যে, উন্নত বিভিন্ন জাতি খোদাকে ছেড়ে দেয়ার কারণেই হয়তো উন্নতি করছে, আর মুসলমানরা ধর্মের অনুসরণের কারণে অধঃপতনের শিকার হচ্ছে বা পশ্চাদপদতার শিকার হচ্ছে। অথচ সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা নিজেদের অকর্মণ্যতা আর তাওয়াক্কুলের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে বসেছে আর যেক্ষেত্রে তারা কিছু করে সেক্ষেত্রেও তাদের approach বা কর্মপন্থা হলো ভ্রান্ত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **কুরআনের একটি আয়াত হলো,** وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ **অর্থাৎ আর আকাশে তোমাদের জীবিকা রয়েছে আর তোমাদের যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাও রয়েছে** (সূরা আয্ যারিয়াত: ২৩)। **তিনি (আ.) বলেন, এর ফলে এক নির্বোধ প্রতারিত হয় আর চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিধানকে নিরর্থক মনে করে। মুসলমানরা বলে, আকাশে তোমাদের রিয্ক রয়েছে আর যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা তা লাভ হবেই কাজেই কিছু করার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্‌ই সবকিছু প্রেরণ করবেন। তিনি (আ.) বলেন, অথচ সূরা জুমুআয় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ **অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় আর খোদার কৃপা সন্ধান কর** (সূরা আল্ জুমুআ:১১)। **এখানে কৃপা সন্ধানের অর্থ হলো, পরিশ্রম কর আর নিজেদের শক্তিবৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাও।** তিনি (আ.) বলেন, **এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এক দিকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে অপরদিকে পুরোপুরি আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করতে হবে। এটি দৃষ্টিতে থাকা চাই যে, পুরো চেষ্টা করতে হবে, বাহ্যিক যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলোকে থেকেও পুরোপুরি কাজ নাও, এরপর খোদার ওপর নির্ভর কর। এটিই প্রকৃত মু'মিনের লক্ষণ বা চিহ্ন।** তিনি (আ.) বলেন, **এর মাঝে শয়তানী কুমন্ত্রণারও অনেক আশংকা থাকে অর্থাৎ চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করা, দু'য়ের মাঝে পার্থক্য বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উভয়টিকে দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। শয়তান এই উভয়ের মাঝে ঢুকে বাধ সাথে, প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টি করে আর ঈমান নষ্ট করে। তাই এটি দৃষ্টিতে রাখবে।** তিনি (আ.) বলেন, **অনেকে হোঁচট খেয়ে উপকরণ পূজারীও হয়ে যায়। অনেকেই খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তিকে অর্থহীন মনে করে বসে। তিনি (আ.) বলেন, মহনাবী (সা.) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন পুরো প্রস্তুতি নিয়ে যেতেন, ঘোড়া ও অস্ত্র-সস্ত্রও সাথে নিতেন। বরং তিনি অনেক সময় দু-দু'টি বর্ম পরিধান করতেন, তরবারিও কোমরে ঝুলিয়ে নিতেন অথচ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল যে,** وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ। **অর্থাৎ আল্লাহ্**

মানুষের আক্রমন থেকে তোমাকে নিরাপদ রাখবেন (সূরা আল্ মায়েদা: ৬৮)। **অতএব চেষ্টা-সাধনার পর আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সব বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমের পর তওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে নতুবা খোদা তা'লার কৃপা লাভ করা যায় না।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, **"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে কল্যাণ সন্ধান করবে"**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর একটি খুবই আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা করেছেন। আমি এখানে সেটি তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম করেছেন, **"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে"**। উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, আর সেই সময় যখন আসবে অর্থাৎ যখন বাদশাহ্‌রা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে তখন এমন আহাম্মক কে হবে যে, তোমাদের দ্বারা আশিস মন্ডিত হওয়ার চেষ্টা করবে না? কাপড় তো জড়বস্তু, তাঁর সামনে তখন কিছু সাহাবী হয়তো বসে থাকবেন আর অনেকেই তাবেঈন বা কতিপয় তবা-তাবেঈনও হয়তো হবেন। তিনি (রা.) বলেন, এমন আহাম্মক কে হবে যে তোমাদের মাঝে কল্যাণ অন্বেষণ করবে না। কাপড় তো জড়বস্তু আর তোমরা জীবিত। সেই সময় যখন আসবে, বাদশাহ্‌রা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পোষাকে কল্যাণ সন্ধান করবে তখন তাঁর সাহাবীগণ, তাবেঈন এবং তবা-তাবেঈনদের মাঝেও তাদের মর্যাদা অনুসারে বরকত অন্বেষণ করা হবে। তোমরা কি দেখনি, হযরত ইমাম আবু হানীফা মহানবী (সা.) থেকে কত পরের যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন বা এসেছেন? কিন্তু বাগদাদের বাদশাহ্‌ও তার সত্ত্বায় বরকত অন্বেষণ করতো আর শুধু তার মাঝেই নয় বরং তার শীষ্যদের মাঝেও বরকত অন্বেষণ করতো। অতএব তোমরা খোদার কাছে দোয়া করতে থাকো যেন শক্তি অর্জনের পর যুলুম বা অন্যায় না আবার শুরু করে না দাও! আর তোমাদের শান্তিপ্রিয়তা যেন বাধ্যবাধকতার শান্তিপ্রিয়তা না হয়। অর্থাৎ এমন নেকী যেন না হয় যা কেউ বাধ্য হয়ে করে। অর্থাৎ তোমাদের নেকী যেন বাধ্য হয়ে না হয়। তোমাদের পুণ্য যেন প্রকৃত অর্থেই পুণ্য হয়। তিনি (রা.) বলেন, যদি ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর অত্যাচারী হয়ে যাও তাহলে তোমার আজকের সমস্ত নমনীয়তা, কোমলতা, বিনয় অর্থহীন প্রমাণিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, পূর্বে তোমাদের নখ ছিল না তাই মাথা চুলকানোর প্রয়োজন হয়নি, এখন নখ দিয়েছি তাই তোমরা মাথা চুলকাতে শুরু করেছ! অতএব তোমরা আনন্দিত হও, উল্লসিত হও আর পাশাপাশি ইস্তেগফারও কর আর নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও দোয়া কর, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ আমরা শান্তির কথা বলি, নিরাপত্তার কথা বলি, শান্তিপ্রিয়তার কথা বলি, কিন্তু সবকিছু যখন হাতে আসবে আর বাদশাহ্‌রা যখন আহমদী মুসলমান হবে এবং বরকত বা আশিস সন্ধান করবে তখন আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও

নিরাপত্তার বাণী এবং ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির প্রসার ও প্রচার হওয়া চাই নতুবা, আমাদের আজকের এসব কিছু বাধ্যবাধকতাই গণ্য হবে।

তিনি (রা.) বলেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম **"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে"** পূর্ণতা লাভ করবে। বাদশাহাত ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্টও বাদশাহ্ই হয়ে থাকেন। যদি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট মুসলমান হয়ে যায় তাহলে একজন বাদশাহ্র মর্যাদা থেকে তারা কম মর্যাদার হবে না। তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পোশাকে অবশ্যই বরকত সন্ধান করবে। কিন্তু তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বস্ত্রে **বস্ত্র হতে** তখনই আশিস সন্ধান করবে যখন তোমরা তাঁর (আ.) রচনাবলীতে বরকত সন্ধান করতে থাকবে। এটি একটি আন্তঃসম্পর্ক, যার কথা তিনি বলছেন। সেই বাদশাহ্ তখন আশিস অন্বেষণ করবে যখন তোমরা যারা পুরনো আহমদী, প্রবীণ আহমদী, সাহাবীদের সন্তান আখ্যায়িত হও, তাবেঈন বা তবা-তাবেঈন আখ্যায়িত হও বা বাদশাহ্দের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণকারী, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর রচনাবলীতে বরকত সন্ধান কর। আর এর অর্থ হলো, তাঁর পুস্তকাবলী পাঠ কর এবং জ্ঞান অর্জন কর। সেসব মসলা-মসায়েলের জ্ঞান অর্জন কর যা সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কিত।

তিনি (রা.) বলেন, যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থে তোমরা বরকত বা আশিস সন্ধানে রত হও তাহলে খোদা তা'লা এমন ব্যবস্থা করবেন যে, মানুষ তাঁর পোশাকে বরকত সন্ধান করবে। তবলীগ হবে, জামাতের প্রচার হবে, বাদশাহ্রা আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। তখন তারাও বরকত অন্বেষণের চেষ্টা করবে। এরপর তিনি আঞ্জুমানকে সম্বোধন করে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন তবার্রুক বা বরকতকময় স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, কাপড় ইত্যাদি রয়েছে যা সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রেখে যাওয়া বরকতময় স্মৃতিচিহ্নের সংরক্ষণের জন্য রাবওয়াতেও আর কাদিয়ানেও কাজ হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেকটা কাজ হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষিত করার চেষ্টা চলছে।

যাহোক তিনি আঞ্জুমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আঞ্জুমানের কাজ হলো, এই তবার্রুক বা পবিত্র স্মৃতিচিহ্নকে সংরক্ষণ করা। কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞদের ডাকা উচিত, যারা এটি নিয়ে ভাববেন বা চিন্তা করবেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাপড় বা বস্ত্র কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এসব কাপড় কাঁচবন্ধ করে এমনভাবে রাখা যেতে পারে যেন শত শত বছর তা সংরক্ষিত থাকে অথবা এমন দেশে তা পাঠানো যেতে পারে যেখানে কাপড়ে সহজে পোকা ধরে না, যেমন আমেরিকায় পাঠানো যেতে পারে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা থেকে আশিসমন্ডিত হতে পারে।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল, বয়সে বড় হওয়ার কারণে তাঁর **'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু'** খচিত আংটিটি যেন আমার ভাগে আসে। আমরা তিন ভাই ছিলাম, আংটিও তিনটিই ছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বা বাসনা সত্ত্বেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান লটারী করেন বা টস করেন আর অদ্ভুত ব্যপার হলো, তিনি তিনবার টস করেছেন আর তিন বারই **'আলাইসাল্লাহ্'**র আংটিটি আমার নামে উঠে আর **'গারাসতু লাকা বেইয়াদি ওয়া রহমাতী ওয়া কুদরাতী'** খচিত আংটিটি মিয়া বশীর আহমদ সাহেবের নামে আসে। (যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দ্বিতীয় ভাই ছিলেন) আর তৃতীয় আংটি যা মৃত্যুর সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে পরিহিত অবস্থায় ছিল, যাতে লেখা ছিল **'মওলা বাস্'** তিন বারই তা মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের নামে উঠে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার কত সুন্দর নিয়ন্ত্রণ। একবার লটারী করলে ভুল হতে পারে কিন্তু তিনবার লটারী করা হয়েছে বা টস করা হয়েছে আর তিনবারই 'আ লাইসাল্লাহ্' খচিত আংটিটি আমার নামে এসেছে আর মিয়া বশীর আহমদ সাহেবের নামে **'গারাসতু লাকা বেইয়াদী ওয়া রহমাতী ওয়া কুদরাতি'** খচিত আংটিটি আসে আর মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের ভাগে আসে সেই আংটি আসে যাতে **'মওলা বাস্'** লেখা ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে **'আ লাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু** খচিত আংটিটি জামাতের হাতে সোপর্দ করব। তখন তিনি একথাও বলেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাদের কাছে এটি সংরক্ষণেরকোন সুব্যবস্থা নেই, আমি তোমাদের কাছে ততক্ষণ এটি কীভাবে হস্তান্তর করব যতক্ষণ এর তত্বাবধানের দায়িত্ব জামাত নিবে না। যদি এটি আমার সন্তান-সন্ততির কাছে থাকে তাহলে তারা অন্ততঃপক্ষে এটিকে উত্তরাধিকার মনে করে এর সংরক্ষণতো করবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার আংটি আমার সন্তানদের নয় বরং জামাতকে দেই। এ উদ্দেশ্যে আমি আরেকটি প্রস্তাবও দিয়েছি, আর তাহলো, কাগজে আংটির ছাপ বা প্রতিচ্ছবি নিয়ে বেশি করে ছাপিয়ে এরপর পাথরের আংটি প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু পাথর লাগানোর পূর্বে সেই প্রতিচ্ছবি বা চিত্র গর্তে পুঁতে ফেলা উচিত হবে আর এভাবে এই আংটিগুলোর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আংটির সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ **'আ লাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু'**র পাথরটিও থাকবে আর সেই চিত্র বা প্রতিচ্ছবিও পাথরের নিচে সংরক্ষিত থাকবে। আর এরপর এক একটি আংটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়া উচিত, যেমন একটি আমেরিকা, একটি ইংল্যান্ড এবং একটি সুইজারল্যান্ডে থাকবে। এভাবে অন্যান্য দেশেও একেকটি করে আংটি পাঠনো যেতে পারে, যাতে প্রত্যেক দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ও বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত থাকে। পরে তিনি এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে, **'আ লাইসাল্লাহ্** খচিত আংটিটি খিলাফতের তত্ত্বধানে

দিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি (রা.) বলেন, আমার পরে যিনিই খলীফা হবেন তাকে আমার এ আংটি দিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে একের পর এক হাত বদল হচ্ছে।

তিনি (রা.) বলেন, সম্প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পুরনো হাতের লেখা আমার হস্তগত হয়। আমি সেই লেখাটি ইন্দোনেশিয়া পাঠিয়ে দিয়েছি, যেন এই আমানত সেখানে সংরক্ষিত থাকে, আর এটি থেকে সেখানকার জামাত যেন বরকত মন্ডিত হতে পারে। এখন ইন্দোনেশিয়ার জামাতই বলতে পারে, সেই হাতের লেখা সংরক্ষিত আছে কিনা? কিন্তু ইলহামে কাপড়ের উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করেছেন, **'বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে'**। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাপড় এমনসব স্থানে পাঠিয়ে দেয়া উচিত, যেখানে পুরনো কাপড়ে পোকা ধরে না, যেন দীর্ঘদিন তা সংরক্ষিত থাকে।

এরপর তিনি (রা.) যুবকদের সম্বোধন করে বলেন, যুবকদের এগিয়ে আসা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। কেননা নিত্য-নতুন জিনিস বা নতুন ব্যবস্থাপনা যুবক শ্রেণী উত্তম ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম, কেননা তারা নতুন আলোর দিক থেকে, নতুন শিক্ষার দিক থেকে এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি শিক্ষিত। তিনি (রা.) বলেন, এসবকে ইসলামের সেবার জন্য তাদের ব্যবহার করা উচিত, যেন আপনারাও সেদিন দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন যখন তাদের কারণে দেশের পর দেশ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় ঈমান আনবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইয়ের কথা হচ্ছে। প্রথম দিকে কীভাবে বই ছাপা হতো সে সংক্রান্ত কথা আসছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বই রচনা করছিলেন, প্রাথমিক যুগের কথা, তখন উপায়-উপকরণ খুবই সীমিত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে লিপিকারদের নখরা বা ন্যাকামো সহ্য করতেন আর কীভাবে মান ভাল রাখার চেষ্টা করতেন সে সময়কার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মীর মেহেদী হাসান সাহেবের কথা উল্লেখ করেন। (এটি সে যুগের কথা বলা হচ্ছে, যে যুগে তিনি আহমদী ছিলেন না) মীর সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ছাপার দায়িত্বে ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন বইয়ের অনুলিপি ছাপলে তিনি খুব মনোসংযোগ করে তা পড়তেন। (এটি পরের যুগের কথা হচ্ছে) দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন দাঁড়ি ভুল জায়গায় দেয়া হলে তিনি সেই কপি নষ্ট করিয়ে নতুন করে লেখাতেন, এভাবে কর্মচারীরা ২/৪ দিন বা যতক্ষণ নতুন কপি প্রস্তুত না হত বেকার বসে থাকত। সে যুগের প্রেস এবং লেখার ব্যবস্থা ভিন্ন ছিল। আজকালকার মত নয় যে, কম্পিউটারে বসে তাৎক্ষণিকভাবে ছাপিয়ে দিবে। এসব সত্ত্বেও আজকালও অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। যাইহোক, তিনি বলেন, এটি প্রস্তুত হওয়ার পর তিনি আবার তা পড়তেন এবং ভুল দেখলে পুনরায় সেটি নষ্ট করিয়ে ততক্ষণ বই ছাপতে দিতেন না, যতক্ষণ নিশ্চিত না হতেন যে, এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করতেন, বই ছাপতে এত বিলম্বের হেতু কী? তিনি বলতেন যে, হুযূর! প্রুফে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও পরিষ্কার এবং ভাল জিনিস পছন্দ করতেন, তাই কখনো তিনি এটি মনে করতেন না যে, শ্রমিকরা বা কর্মীরা এমনিতেই বসে আছে আর অনর্থক পয়সা নিচ্ছে। তাঁর এই চিন্তা ছিল না যে, লিপিকার বা অন্যান্য কর্মীরা বেকার বসে আছে। তিনি বইয়ের উন্নত মান চাইতেন আর বলতেন, ঠিক আছে, মান উন্নত হওয়া চাই। কর্মীরা কয়েক দিন বেকার থেকে বেতন ভোগ করলেও কোন অসুবিধা নেই। তিনি মানুষের সামনে ভাল জিনিস উপস্থাপন করা পছন্দ করতেন।

এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরেকটি অভ্যাস ছিল, বইয়ে সামান্য ত্রুটি থাকলেও তা ছিড়ে বলতেন, আবার লিপিবদ্ধ কর। লিপিকার পুনরায় লিপিবদ্ধ করত, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেটি যতক্ষণ পুনরায় ভালভাবে লেখা না হতো, তিনি প্রবন্ধ ছাপতে দিতেন না। মসীহ্ মওউদ (আ.) যার হতে লেখাতেন প্রথম দিকে তিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তার ছেলেও আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তার মাঝে অর্থাৎ লিপিকারের মাঝে একটি ভাল গুণ যা ছিল তাহলো, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গুরুত্ব বুঝতেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাকে চিনতেন। অ-আহমদী হওয়া সত্ত্বেও যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুলেখকের প্রয়োজন হতো বা লিপিকারের প্রয়োজন হতো তাকে কাদিয়ান ডাকা হতো। তিনি বলেন, সেযুগে বেতন যৎসামান্য হতো। মাসিক ২৫ রুপি এবং খাবারের জন্য ভাতা দেয়া হতো। লিপিকারের অভ্যাস ছিল, কাজ সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসতেন এবং বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি (আ.) বলতেন, এত তাড়াহুড়ার কি আছে? এখনও বই এর ছাপাকাজ চলছে। আমাদের লিপিকারের প্রয়োজন, তিনি বলতেন, হুযূর, আমাকে যেতেই হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন এখনও তো কিছু লেখার কাজ বাকী আছে। তিনি বলতেন, হুযূর এখানে রুটি বানাতে হয়, এতে আমার সারাটা দিন নষ্ট হয়ে যায়। রুটি বানাবো, না লিখবো? আমার সারা দিন রুটি বানাতেই কেটে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আচ্ছা আমি আপনার রুটির ব্যবস্থা অতিথিশালা থেকে করিয়ে দিচ্ছি। এভাবে তিনি ৩৫রুপি বেতনও পেতেন আর বিনামূল্যে খাবারও পেতেন। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় হুযূরের কাছে এসে বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি। হুযূর জিজ্ঞেস করতেন, ব্যাপার কি? তিনি বলতেন, হুযূর লঙ্গর খানার রুটিও কি রুটি হল ? ডাল পৃথক, পানি পৃথক আর লবনও থাকে না। (এখানেও আজকাল অনেক সময় এভাবেই রান্না করা হয়) কোন সময় এত বেশি মরিচ ঢেলে দেয়া হয় যে, শুষ্ক রুটি খেতে হয়, এই রুটি খেয়ে কোন মানুষ কাজ করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক

আছে, বল কি করব? তিনি বলতেন, এর জন্য অতিরিক্ত কিছু অর্থ আমাকে দিন, এই সমস্যার চেয়ে স্বয়ং রুটি বানানোর কষ্ট সহ্য করা শ্রেয়। আমি নিজেই রুটি বানিয়ে নিব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন আরো ১০রুপি বৃদ্ধি করেন এবং বলেন, ঠিক আছে এখন থেকে আপনাকে মাসিক ৪৫ রুপি দেয়া হবে। ২৫ থেকে ৪৫ রুপিতে উপনীত হয়। ১০ দিন পর তিনি আবার এসে বলেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন, এখানে সারাদিন রুটি বানাতেই সময় চলে যায়, কাজ আর কি করব? তখন তিনি বলতেন, তাহলে কি করা যায়। তিনি বলেন, হুযূর! লঙ্গরখানায় ব্যবস্থা করিয়ে দিন। তিনি (আ.) বলতেন, ঠিক আছে, তুমি ৪৫ রুপি পাবে আর খাবারও লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা থেকেই ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। তিনি ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করতেন। কিছুদিন পর আবার এসে বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমি যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি, হুযূর জিজ্ঞেস করতেন ব্যাপার কি? তিনি বলতেন, হুযূর, লঙ্গরখানার রুটি আমি খেতে পারি না, এটি কোন রুটি হলো, আপনি আমাকে রুটির জন্য পৃথক ১০ রুপি দিন, আমি নিজেই ব্যবস্থা করব। হুযূর আরো ১০ রুপি বৃদ্ধি করে ৫৫ রুপি করে দেন। সে ব্যক্তি যেহেতু হুযূরের পবিত্র অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই তিনি তার ছেলেকে বলে রেখেছিলেন, আমি তোমার পিছনে লাঠি নিয়ে ছুটবো আর তুমি হৈ-চৈ করতে করতে হুযূরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করবে। এভাবে পিতা লাঠি নিয়ে ছেলের পিছনে ছুটতো আর সেই ছেলে হৈ চৈ বা চিৎকার করতে করতে হুযূরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করত আর বলতো, আমাকে মেরে ফেলছে, আমাকে মেরে ফেলছে। ততক্ষণে পিতাও সেখানে এসে পৌঁছতো আর বলতো, বাইরে আস্ আমি তোকে দেখে নিচ্ছি। হুযূর এই অবস্থা দেখে, জিজ্ঞেস করতেন, কি হয়েছে, ছোট ছেলেকে কেন পেটাচ্ছ? সে উত্তর দিত, হুযূর, ৭/৮ দিন পূর্বেই তাকে জুতা কিনে দিয়েছি আর সে হারিয়ে এসেছে, আমি কিছু বলিনি, পুনরায় কিনে দিয়েছি আবার হারিয়ে ফেলেছে, এখন আমার জুতা কিনে দেয়ার সামর্থ কোথায়, তাই আমি তাকে শাস্তি দিব, যদি আজকে শাস্তি না দিই তাহলে আগামীকাল আবার জুতা হারিয়ে ফেলবে। হুযূর বলেন, মিয়া জুতার দাম কত বল? সে বলত, ৩ রুপি। হুযূর বলতেন, যাও আমার কাছ থেকে ৩ রুপি নিয়ে যাও আর তাকে কিছু বলো না। এভাবে ৩ রুপি নিয়ে সে ফিরে আসত। চার দিন পার হতে না হতেই পুনরায় ছেলে হৈ চৈ করত আর হুযূরের কামরায় প্রবেশ করত, আর হৈ চৈ করে সেই ব্যক্তিও লাঠি নিয়ে আবার তার পিছনে ছুটে আসত আর বলত, বাইরে আয়। সেদিন হুযূরের বলাতে ছেড়ে দিয়েছি, আজকে তোকে ছাড়ব না। হুযূর জিজ্ঞেস করতেন ব্যাপার কি? ছেলেকে মারছো কেন? সে বলত, হুযূর, সেদিন তো আপনার বলার কারণে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আজ একে ছাড়ব না, আজকে পুনরায় জুতা হারিয়ে এসেছে। হুযূর বলেন, তাকে মেরো না, জুতার ক্রয় মূল্য আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও। এভাবে পুনরায় যে টাকা বলত, তা হুযূরের কাছ থেকে নিয়ে চলে

যেত আর বলতো, হুযূর এবার ছাড়তাম না শুধু আপনার বলার কারণেই ওকে ক্ষমা করছি। বস্তুতঃ সেই লোক এমনটি করতেই থাকতো। কিন্তু অনুলিখনের কাজ এত সুন্দরভাবে করত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার হাতেই বই এর অনুলিখন করাতেন আর কোন সাধারণ লিপিকারের হাতে লিখিয়ে খারাপ করা পছন্দ করতেন না, কেননা মানুষের দৃষ্টিতে এভাবে কিতাবের মান হ্রাস পায়।

যাহোক চুটকি বা কৌতুক হিসেবে জুতার কথা উল্লেখ করেছেন বা বেতন বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বই ছাপা সম্পর্কে যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা স্পষ্ট হয়। অন্যদের সামনে ইসলামের সুরক্ষা ও এর সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য যথাসাধ্য উত্তম জিনিস উপস্থাপন করা উচিত আর স্বজনদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও সর্বোত্তম রূপে ইসলামের চিত্র সামনে ফুটিয়ে তোলা উচিত।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগ সহ পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে, তবলীগের আগ্রহও বাড়বে। এরফলে আমাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে আর পৃথিবীবাসীকে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করার আমরা যোগ্যতা লাভ করবো। আসল বরকত এবং কল্যাণ হলো, বাদশাহ্দের ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হওয়া আর তাদের নিজেদের জীবনকে সেই অনুসারে পরিবর্তন করা। নতুবা অধিকাংশ বরং বলা উচিত, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব মুসলমান বাদশাহ্ এবং নেতা এখন ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে। মুখে ইসলামের জপে কিন্তু হৃদয় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পিছনে ছুটছে, যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে তাদের হাতে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যেখানে ইসলামের প্রসার এবং প্রচার হওয়ার কথা, তাঁর পোশাক থেকে মানুষের আশিস সন্ধান করার কথা, যেসব বাদশাহ্রা তাঁর মাধ্যমে আসবে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করেই আসবে। এটিই প্রকৃত আশিস এবং বরকত বা কল্যাণ আর এর জন্য আমাদেরও এ প্রকৃত শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করা উচিত আর সে অনুসারে তবলীগ হওয়া উচিত। যুবকদেরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, তবেই **'বাদশাহ্ তোমার পোশাকে আশিস অন্বেষণ করবে'** এর সত্যিকার মর্ম এবং অর্থ আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে আর আমরা তা বুঝতেও পারবো আর তবলীগের উন্নত মানও আমরা অর্জন করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে একথা বুঝার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযাও পড়াবো, দু'টো উপস্থিত জানাযা আর একটি গায়েবানা জানাযা।

একটি হলো জনাব চৌধুরী আব্দুল আযীয ডোগার সাহেবের, যিনি কিছুকাল থেকে যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রিতে বসবাস করছিলেন। ২০১৬ সনের ১১ই জানুয়ারী

বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মাষ্টার চেরাগ দ্বীন সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। কাদিয়ানের নিকটবর্তী খারা ছিল তার পৈত্রিক নিবাস। মাষ্টার চেরাগ দ্বীন সাহেব হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের ক্লাস সহপাঠী হওয়ারও সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। খারা'য় তাদের পরিবারে আহমদীয়াত তার দাদা হযরত চৌধুরী আমীর বক্স সাহেবের মাধ্যমে এসেছে, আযীয ডোগার সাহেবের পিতার কথা হচ্ছে এখানে।

চৌধুরী আব্দুল আযীয ডোগার সাহেবও সারা জীবন জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি প্রায় ৩১ বছর পর্যন্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দাওয়াখানায় মানব-সেবার কাজ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এরই দাওয়াখানা ছিল এটি, তাতে তিনি কাজ করেছেন, হুযূর স্বয়ং তাকে হিকমত বা দেশীয়-ভেষজ চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখিয়েছেন। চতুর্থ খিলাফতের যুগে কেন্দ্র তাকে গাম্বিয়া এবং জার্মানী ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠিয়েছে। এভাবে তার জামাতি বিভিন্ন ভবন বা বিল্ডিং নির্মাণের সুযোগ হয়েছে। রাবওয়ায় অবস্থানকালে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ায় মোহতামীম মোকামী হিসেবেও কাজ করেছেন আর কয়েক বছর তাহরীকে জাদীদেও খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭৪-এ আল্লাহ্‌র পথে বন্দী জীবন কাটানোরও তার সৌভাগ্য হয়। আহমদী চিকিৎসক এশোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং আহমদী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সনে তিনি লন্ডন থেকে কভেন্ট্রীতে স্থানান্তরিত হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে সেক্রেটারী তরবীয়ত এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও (তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন) আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকল অনুষ্ঠানে অংগ্রহণের চেষ্টা করতেন। জার্মানী এবং ইউরোপের ট্যুরে আমি যেখানেই যেতাম, দেখতাম যে তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন। সম্প্রতি অসুস্থ ছিলেন তা সত্ত্বেও অনেক চেষ্টা করে তিনি হল্যান্ডের সংসদে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কয়েকটি বই প্রকাশের সৌভাগ্যও তার হয়েছে। যেমন সীরাত হযরত আম্মাজান, সীরাত হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া এবং 'আক্বওয়ালে যাররীঁ' নামে পুস্তিকা ছাড়াও চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের একটি বই প্রকাশ করারও সুযোগ পেয়েছেন। খুবই ভদ্র, মিশুক, নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। তার চার কন্যা এবং তিন পুত্র রয়েছে। ছেলে জার্মানীতে জামাতের কাজের সৌভাগ্য পাচ্ছেন, মেয়েও মিডল্যান্ড লাজনার প্রেসিডেন্ট। তার ভাই তৈয়্যব সাহেব বলেন, ১৯৪৭ সনে

যখন হিজরত করেন তখন মাকে অসুস্থ অবস্থায় কাদিয়ান থেকে শিয়ালকোট পর্যন্ত কাঁধে বহন করে নিয়ে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও তার এই সেবার কথা এক খুতবায় উল্লেখ করেছেন। তার গ্রাম ছিল 'খাঁরা' যা কাদিয়ানের পাশেই অবস্থিত। দেশ বিভাগের সময় সেখানে তিনি নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। বড় বীরত্বের সাথে মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ানের দরবেশদের হিফাযত এবং বন্দীদের মুক্তি-সংক্রান্ত কিছু বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি প্রতিনিধি দল নিযুক্ত করেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর ইনচার্জ ছিলেন, তিনিও সেই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। ইলিয়াস মুনীর সাহেব বলেন, তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক এবং ইনচার্জ ছিলেন কিন্তু আমি তাকে শ্রমিকদের মত কাজ করতে দেখেছি। অনুরূপভাবে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ের সময় সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোত্তম জিনিসের সন্ধান করতেন। বাজারে ঘুরে ঘুরে জামাতের অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। একবার তার হাঁটুতে কষ্ট হয়, তিনি বলেন, এটি সাময়িক কষ্ট, এটি স্থায়ী হতে পারে না, কেননা আমার ডান হাঁটুতে একবার হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পা রেখে ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন তাই আশা করি তাঁর কল্যাণে কষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলাফেরাতেই ছিলেন। এক সময় কঠিন অবস্থাও আসে, পরীক্ষার সম্মুখীন হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে সেই সময় অতিবাহিত করেছেন, নিজের ঈমানকে নিষ্কলুষ এবং পবিত্র রেখেছেন। খোদা তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন, করুণায় সিক্ত করুন, তাঁর প্রিয়দের চরণে ঠাঁই দিন। তার সন্তান-সন্ততিকেও সবসময় খিলাফত এবং জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ইকবাল নাসিম আযমত বাট সাহেবার। যিনি গোলাম সারোয়ার বাট সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ১৩ই জানুয়ারী ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি কড়িয়াওয়ালা নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী করম ইলাহী সাহেবের পৌত্রী, হযরত মিরাবক্স সাহেবের দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ মুহাম্মদ বক্স রইছে আযম এর পুত্রবধু, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) **'এক না একদিন পেশ হোগা তু ফানাকে সামনে'** নযমটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত নেক, পুণ্যবতী, সময়মত নামাযে অভ্যস্ত, মিশুক, অতিথি পরায়না, সবার সাহায্যকারীনি একজন ভদ্র মহিলা ছিলেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক ছিল । তিনি মুসীয়া ছিলেন। তিনি ৩জন পুত্র এবং ২ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার ভাতিজা নাসিম আক্তার বাট সাহেব এখানে আঞ্চলিক বা রিজিওনাল আমীর। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন।

একটি গায়েবানা জানাযাও রয়েছে, এটি হলো সিদ্দিকা সাহেবার, যিনি কোরাইশী মোহাম্মদ শফি আবেদ সাহেবের স্ত্রী, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ। ২০১৬ সনের ৬ই জানুয়ারী দীর্ঘদিন সহ্যাসায়ী থাকার পর ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সী মেহের উদ্দিন পাটোয়ারী সাহেবের পৌত্রী এবং হাকীম আব্দুল্লাহ্ ওবায়দুল্লাহ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্বেই তার বিয়ে হয়েছিল, পরে কয়েক বছরের জন্য পাকিস্তানে হিজরত করেন এরপর প্রথম কাফেলাতেই কাদিয়ানে ফিরে আসেন। তিনি তার স্বামীর সাথে সারাজীবন দরবেশীর জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন কাটিয়েছেন। সবর তথা ধৈর্য এবং আল্লাহ্‌র ওপর তওয়াক্কুলের মাঝে জীবন কাটিয়েছেন। মুসীয়া ছিলেন, খুব একটা স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও আর্থিক বিভিন্ন তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তাহাজ্জুদ গুজার ও খোদাভীরু নারী ছিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের কুরআন পড়াতেন। খিলাফতের সাথে ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন ছেলে এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। এক ছেলে কোরাইশী আফযাল সাহেব কাদিয়ানে নায়েব নাযের ইশায়াত, এক ছেলে কোরাইশী মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ্ সাহেব অডিটর হিসেবে জামাতের কাজের সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তার এক জামাতা কাদিয়ানে জামাতের খিদমত করছেন, আরেকজন লাহোরে জামাতের মুরুব্বী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে বিশ্বস্ততার সাথে খিদমতের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।